ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454–1508

Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)

Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1008-1015

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: https://www.atmadeep.in/

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.317

ধর্ম–সাধনা পদ্ধতি: এক অনন্য পরিক্রমা

সুমন্ত রবিদাস, *স্বাধীন গবেষক, কুমারগ্রাম, দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 07.03.2026; Accepted: 10.03.2026; Available online: 31.03.2026

©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

If we look at the literary stream that has been flowing since the Charyapada, the earliest example of Bengali literature, to the very modern times, we will see that there is a deep similarity between all the religions and their methods of practice that are mentioned during this period. If we compare the practices that have been mentioned in all those religions, that is, the path that has been given to attain the attainable object, it will be seen that all religions have spoken of the same path. As many religious views and sects as there have been from the Charyapada to the modern times, the path that all the sects and religious views have given to attain the attainable object, that is, God or Moksha, is basically the same. Starting from the simple Buddhist practice, to the Nath, Vaishnava, Baul, Sufi and Shakta practices, it has been said to purify the mind by freeing it from the illusion of the worldly world, that is, by emptying it of desires and desires, in order to attain the attainable object. At the same time, the same thing has been said as a way to attain the attainable object in the literature written in the modern times. If we look at the literary genre that has developed from the Charya period to the modern era, we will see that in this unique cycle, only the practice of the body is mentioned. That is, it is said that the attainable object can be achieved through the body and that God resides within the body. The path that the ascetics have shown at different times to attain the attainable object is basically the same and all the practices are mentioned there under the guidance of the Guru. That is, a significant role of the Guru in the practice can be seen in all areas.

Keywords: Charjapada, Buddhis, nath sahitya, Vaishnava, sufi, shakta, baoul

বৌদ্ধ সাধন ভাজন সংক্রান্ত চর্যাপদ থেকে শুরু করে নাথ সাহিত্য, বৈষ্ণব সাহিত্য, শাক্ত সাহিত্য, বাউল গান এবং সুফি সাহিত্য পর্যন্ত লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এগুলিতে একই ধরনের সাধন-ভাজন সংক্রান্ত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এগুলির সাধনপদ্ধতি মোটামুটি এক এবং একই কথা বলা হয়েছে। কীভাবে বা কোন পথে ঈশ্বর লাভ করা যায়, যা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চর্যাপদ থেকে শুরু করে সুফিবাদ পর্যন্ত একই পথের কথা বলা হয়েছে। আবার এই সাহিত্য গুলিতে প্রায় গুরুবাদী সাধন পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে।

এক্ষেত্রে আমাদের আলোচ্য বিষয়, কিভাবে এই বিভিন্ন সাহিত্য ধারার মধ্যে একই পথ বা মার্গ এর কথা বলা হয়েছে, তা তুলে ধরাই মূল লক্ষ্য। এই সাধনা গুলির মধ্যে একটা ঐক্য রয়েছে, কিভাবে সাধ্য বস্তুকে লাভ করা যায় তার যে পথের কথা বলা হয়েছে উপরিউক্ত সাহিত্য গুলিতে, সেই পথগুলি মোটামুটি একই। তবে বিভিন্ন রূপকের সাহায্যে তা ব্যক্ত করেছেন বিভিন্ন সাহিত্য বিভিন্নভাবে। তবে আবার কোনো কোনো

রূপক এর মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যাবে। যেমন চর্যাপদে 'ইড়া-পিঙ্গলা'র কথা আছে, আবার তা শক্ত, নাথ সাহিত্যেও আছে। এইরকম কিছু রূপক আছে এবং কিছু গানও আছে, যাদের মূল অর্থ একই। তবে আমাদের সেগুলো শুধু আলোচ্য বিষয় নয়, আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় কিভাবে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাতে সাধ্য বস্তু লাভের জন্য একই পথের কথা বলা হয়েছে।

সাধ্য বস্তুকে (ঈশ্বরকে) কিভাবে পাওয়া যাবে? তার কথা চর্যাপদ থেকে শুরু করে মধ্যযুগের অন্যান্য সাহিত্যের শাখাতেও একই রকম পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। চর্যাপদে যেমন 'কায়া' সাধনার কথা বলা হয়েছে, তেমনি নাথসাহিত্যেও 'কায়াসাধন' পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। যদিও নাথ সাহিত্য ও চর্যাপদ এর সময়কাল কাছাকাছি, আবার একই ব্যক্তি চর্যাপদ রচনা করেছেন এবং নাথ সাহিত্যের পদও রচনা করেছেন। যেমন কাহ্নপাদের (কানফার) পদের কথা চর্যাতেও পাওয়া যাচ্ছে আবার নাথ সাহিত্যেও পাওয়া যাচ্ছে। তিনি চর্যাতে সবথেকে বেশি সংখ্যক পদ রচনা করেছেন (১৩টি); আবার নাথ সাহিত্যে দেখা যায় নিরঞ্জনের কান থেকে কানফার জন্ম হয়ে দেবীর অভিশাপে 'ডাহুক' রাজ্যে চলে যায় শাস্তি ভোগের জন্য- 'তুরিতে গমনে যাঅ ডাহুক চলিয়া।' তবে এই কাহ্নপাদ বা কানফা একই ব্যক্তি কিনা বিতর্ক আছে। কিন্তু সাধন পদ্ধতিগত এবং ভাষাগত মিল আছে। যেমন চর্যার '১' নং পদটিতে আছে-

"কাআ তরুবর পঞ্চবি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল।।
দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভনই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ।।"[১]

এখানে যেমন 'কাআ'(কায়া) রূপ দেহের পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে যেমন পাঁচটি ডাল বলা হয়েছে এবং সেই ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যেমন কায়া সাধনার কথা বলা হয়েছে তেমনি নাথ সাহিত্যেও 'কায়া' সাধনার কথা আছে-

"অচেতন রৈলা গুরু কিছু নয় ভাল,
কায়া সাধিয়া গুরু জিন জম কাল।"[২]

আবার গোর্খনাথ যখন গুরুকে মায়া থেকে মুক্ত হবার আহ্বান জানায়—

"অনন্ত সিধাএ শুনি ঘোষিব কুনাম।।
জ্ঞান এড়ি পাইলা গুরু ভুল কদলীত।
আগে মিঠা লাগে গুরু আছে হএ তিত।।
কামেতে পীড়িত হইআ সভ হল্য দোষ।জীবন তরীতে এবে হল্য কসাকস।।"[৩]

মীননাথ যখন প্রকৃত সত্যকে ভুলে অন্ধ মায়ায় মুগ্ধ হয়ে ছিলেন তখন গোর্খনাথ গুরু মীননাথের চেতনা ফিরিয়ে আনার উপদেশ দিয়েছেন এবং কায়া সাধনার দ্বারা গুরুকে এই মায়া থেকে মুক্তির কথা বলেছেন। এখানে লৌকিক মায়া থেকে মুক্তি এবং জীবনের চরম লক্ষ্য মোক্ষ তথা মুক্তি লাভের কথা বলা হয়েছে। চর্যাপদ এবং নাথ উভয় সাধনায় এই মোক্ষ লাভের পথ নির্দেশ করা হয়েছে, তার সঙ্গে গুরু-শিষ্য পরম্পরাও উভয় সাধনায় লক্ষ্য করা যায়—

যেমন চার্যার '৬' নং পদে আছে-

"কাহেরে ঘিনি মেলি অচ্ছহ কীস।...
তিন ন চ্ছুপই হরিণা পিবই ন পাণী।
হরিণা হরিণির নিলঅ ণ জাণী।।
হরিণী বোলঅ সুণ হরিণা তো।

এ বন চ্ছাড়ী হোহ ভান্তো।।
তরঙ্গতে হরিণার খুর ন দীসঅ।”[৪]

এই পদে 'হরিণ' অর্থাৎ জীবাত্মা আর 'হরিণী' অর্থাৎ পরমাত্মার মিলনের কথা বলা হয়েছে। জীবাত্মা হরিণ মায়ায় পরে সেটাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছিল অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার অংশ হয়েও পরমাত্মাকে ভুলে মায়ার জগতকেই সত্য বলে মনে করে নিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হরিণটির মুক্তি ঘটল এবং শেষে হরিণটির এমন অবস্থা হল যে, মায়ার জগৎ থেকে বেরিয়ে এসে জগতের সব কিছুকে এমন কি খাদ্য- পানীয়কেও বর্জন করল। আর তখনই পরমাত্মার আহ্বানে তার মুক্তি ঘটল। আবার '২৮' নম্বর পদে আছে দেহের মধ্যে উচ্চতম শৃঙ্গের নৈরাত্মার অবস্থান যা বাউল সাধকেরাও মনে করেন দেহের মধ্যে ঈশ্বরের অবস্থানকে। তাই তারা দেহ সাধনার কথা বলেন–

"আমার মনের মানুষ যে রে,
আমি কোথায় পাব তারে,
হারায়ে সেই মানুষে দেশবিদেশে
বেড়াই ঘুরে ঘুরে।।”[৫]

এখানে 'মনের মানুষের' সাধনার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ ঈশ্বরের সাধনার কথা বলা হয়েছে। দেহের মধ্যেই যে পরম ঈশ্বরের বাস, তা আমরা মায়ায় পড়ে না বুঝেই মন্দির-মসজিদে অর্থাৎ দূরতম স্থানে অর্থাৎ দেশ-বিদেশে মনের মানুষ তথা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে খুঁজে চলি আজীবন। দেহের উচ্চতম শৃঙ্গ দেহের উচ্চতম শৃঙ্গে সবরীরূপী ঈশ্বর তথা মনের মানুষের যে পরম অবস্থান, তা আমরা ভুলে যাই। দেহের মধ্যে যে ঈশ্বরের অবস্থান বাউলেরা স্বীকার করে নিয়েছে; আবার সুফিরাও একই কথায় বলেছে। কিন্তু এই ঈশ্বরকে আমরা চিনতে পারি না, বিভিন্ন সাজসজ্জায় আবৃত থাকার কারণে। তাই '২৮' নং চরর্যায় আছে–

"উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী।।....
নানাতরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী।
একেলী শবরী এ বন হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারী।।”[৬]

এই নৈরাত্মা রূপি অর্থাৎ ঈশ্বর ময়ূরপুচ্ছ অর্থাৎ ভাববিকল্পাদি, কর্ণকুণ্ডল অর্থাৎ জ্ঞানমুদ্রা আবৃত থাকায় আমরা তাকে চিনতে পারি না। তেমনি নাথ সাহিত্যে (গোর্খবিজয়ে) দেখা যায় মীননাথ যখন মায়ায় পড়ে সত্যটাকে চিনতে পারছেন না তখন গোর্খনাথ গুরুকে উদ্ধারের জন্য বলেছিলেন–

"কদলীত আসিয়া পাইলা উপভোগ,
কামিনীর কোল পাইয়া পাসরিলা যোগ।
আপনি হইলা ভুলা না চিনিলা পিছে,
গুরুর বচন তুমি সব কৈলা মিছে।”[৭]

এখানে মীননাথ মায়ায় পড়ে গুরুর সব বচন ভুলে গেছে এবং মায়াকেই সত্য বলে মেনে নিয়েছে। কিন্তু গোর্খনাথ শেষ পর্যন্ত মীননাথের পুত্র বিন্দুনাথকে মেরে ফেলে আবার বাঁচিয়ে দিয়েছে এবং শেষে সকলকে বাদুড়ে পরিণত করেছে। এভাবে গুরুকে সত্য দর্শন করিয়েছে যে, জগতের সবকিছুই মিথ্যা, একমাত্র ঈশ্বরই সত্য। এই সত্য দর্শনের পর মীননাথ আবার স্বধর্মে বা কর্মে ফিরে আসে। নিজের কি করনীয় তা সে বুঝতে পারে। আবার মুক্তি কিভাবে আসে তা বলতে গিয়ে চর্যায় বলা হয়েছে–

"নাদ ন বিন্দু ন রবি না সসিমন্ডল।
চিঅরাঅ সহাবে মুকুল।।
উজ্জুরে উজ্জু ছাড়ি মা লেহুরে বঙ্ক,
নিঅহি বোহি মা জাহুরে লাঙ্ক।।"[৮]

এই একই কথা '৫' নং চর্যাতেও আছে–

"সাঙ্কমত চড়িলে দাহিণ বাম মা হোহী।
নিয়ড্ডী বোহী দূর মা জাহী।"[৯]

অর্থাৎ সাধ্য বস্তুকে পেতে হলে ডান-বাঁম বা বাঁকা পথে যাওয়া উচিত নয়, সব সময় সোজা পথে অর্থাৎ সমস্ত রকম লোভ- লালসা, কামনা-বাসনা, মায়া-মোহ ত্যাগ করে ঈশ্বরের সাধনা করা উচিত। সাধন পথে যেতে যেতে কখনো কামাসক্ত হওয়া যাবে না বা ডান-বামে চলা যাবে না অর্থাৎ চিত্তকে সব সময় শূন্য রাখতে হবে। কখনো ইড়া ও পিঙ্গলা দ্বারা অর্থাৎ লোকজ্ঞান ও লোকভাস দ্বারা যেন সেই পথ অবরুদ্ধ না হয়। তাই গোর্খনাথ গুরু মীননাথকে বলেছে–

"বেঙ্কানালে সাধ গুরু না করিহ হেলা।
ইঙ্গলা পিঙ্গলা দুই বশ করা ভালা।।[১০]

বাউলেও আছে নাথ সাহিত্যের মত চারি চন্দ্রের কথা। লালনের একটি গানে আছে-

"চেয়ে দেখ না রে মন দিব্য নজরে।
চারি চাঁদ দিচ্ছে ঝলক মণিকোটার ঘরে।
হলে সেই চাঁদের সাধন অধরা চাঁদ পায় দরশন,
পায় রে চাঁদেতে চাঁদের আসন রেখেচে ফিকিরে।।"[১১]

এখানেও সেই চার চাঁদের কথা বলেছেন লালন। এই চার চাঁদের সাধনা করলে অধরা চাঁদ পাওয়া যায়। অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ত্যাগ করে অধরা চাঁদের অর্থাৎ মনের মানুষের বা ঈশ্বরের সাধনা করলে তাকে পাওয়া যায়। কিন্তু তার জন্য আগে মায়া মুক্ত হতে হবে। অর্থাৎ চোখের সামনে দৃশ্যমান জগতের মায়াকে দূরীভূত করতে হবে এবং মনের সেই দিব্য নজরকে জাগাতে হবে, তবেই সাধ্যবস্তুকে পাওয়া যাবে। এই একই কথা বৈষ্ণব সাধনায়ও রয়েছে। তারা 'রাধা-কৃষ্ণ' রূপকের মাধ্যমে তার কথা বলেছে। রাধা অর্থাৎ 'জীবাত্মা' কৃষ্ণ অর্থাৎ 'পরমাত্মার' অংশ হয়েও প্রকৃত স্বরূপ ভুলে এই মায়ার জগতে পড়ে আছি আমরা সকলে। সকল জীবকে রাধা বলে অভিহিত করেছে বৈষ্ণব সাধকরা। রাধাকে যেমন দেখা গিয়েছিল যে, শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রী (লক্ষী) হয়েও নিজের সব ভুলে গিয়ে আইহনের ঘরনীতে পরিণত হয়েছে, কৃষ্ণকে সে তখন আর চিনতে পারছে না। কিন্তু মাঝেমধ্যে বাঁশির শব্দে তার মন বিচলিত হচ্ছে। ঠিক তেমনি কৃষ্ণের বাঁশির শব্দ আমাদের কানে এসে পৌঁছায় না, যারা সিদ্ধ যোগী তারাই মাত্র তারা আভাস পায়। রাধার মতো আমরাও মায়ায় পড়ে নিজের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে ভুলে গিয়েছি এবং মায়ার জগত- সংসারকেই সত্য বলে মেনে নিয়েছি। একমাত্র সিদ্ধ সাধকেরাই সেই বৃন্দাবনে কৃষ্ণের বাঁশির আওয়াজ শুনতে পায়, কিন্তু তাদের কাছেও তা ধরাছোঁয়ার বাইরে। শুধুমাত্র মনকে মাঝেমধ্যে বিচলিত করে। শেষপর্যন্ত যেমন রাধার মায়া কেটে গিয়েছিল এবং নিজেকে ও কৃষ্ণকে চিনতে পেরেছিল, সেই জন্যই বৈষ্ণব সাহিত্যে এই 'রাধা' ও 'কৃষ্ণ' রূপকে সাধনতত্ত্বের কথা বলা হয়েছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মূল তত্ত্ব হল 'অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব' এই তত্ত্বের উপরই এই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। এই তত্ত্বে বলা হয়, জগতের সব কিছু ব্রহ্ম থেকে সৃষ্টি। অর্থাৎ এই জীবজগৎও ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বা কৃষ্ণ থেকে সৃষ্টি। সুতরাং সমস্ত কিছুই কৃষ্ণের অংশ। সেই জন্য ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে কিছু ভেদ বা বৈসাদৃশ্য এবং কিছু

অভেদ বা মিল আছে। যেমন মাতা-পিতার সঙ্গে সন্তানের ভেদাভেদ আছে, তেমনি কৃষ্ণ ও জীব অর্থাৎ ভক্ত ও ভগবানের মধ্যেও ভেদাভেদ আছে। কিন্তু আমরা মায়ায় পড়ে তা যাই, যেমন রাধা মায়ায় পড়ে প্রকৃত স্বরূপ ভুলে গিয়েছিল। তেমনি আমাদের দেহের স্বরূপকে জানতে হবে আর তার জন্য প্রয়োজন মায়া অপসারণ করা। এইজন্য চর্যাপদ, বাউল, নাথ সাহিত্য, শাক্ত, সুফি প্রভৃতি সাধনায় দেহ সাধনা, মায়া মুক্তির কথা বলা হয়েছে। জীবজগৎ যে কৃষ্ণের অংশ তা বোঝাতে 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন-

"অনন্ত স্ফটিক যৈছে এক সূর্যভাসে।
তৈছে জীব গোবিন্দের অংশ প্রকাশে।।"[১২]

দেহের মধ্যে যে ঈশ্বরের অবস্থান এবং দেহ সাধনার দ্বারাই যে জীবের সাধ্য বস্তু লাভ সম্ভব, সেকথা শাক্ত সাহিত্যেও আছে। রামপ্রসাদ সেন এর একটি পদে আছে-

"ডুব দে রে মন কালী বলে।
হৃদিরত্নাকরের অগাধ জলে।।
রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দুচার ডুবে ধন না পেলে।
তুমি দম-সামর্থে এক ডুবে যাও, কুলকুণ্ডলিনীর কূলে।।"[১৩]

এখানেও সেই দেহের মধ্যে 'রত্নাকরের' অবস্থানকেই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ দেহের মধ্যে ঈশ্বরের অবস্থানকে বোঝানো হয়েছে এবং দেহের মধ্যে সেই রত্ন আরোহন করা অর্থাৎ ঈশ্বর লাভের কথাই এখানে বলা হয়েছে। আবার শক্ত সাহিত্যেও সেই মায়াবাদ এর কথা এসেছে রামপ্রসাদের একটি পদে-

"কেবল আশার আসা, ভবের আসা, আসা মাত্র হলো
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে ভ্রমর ভুলে রলো।।
মা নিম খাওয়ালে চিনি বলে, কথাই করে ছলো।
ওমা! মিঠার লোভে, তিত মুখে সারা দিনটা গেলো।।"[১৪]

এই পদেও আছে মায়ার কথা, যে কথা চর্যাপদ থেকে শুরু করে বাউল, সুফি বিভিন্ন সাধনায় আছে। এই পদে পদকর্তা মায়ের (ঈশ্বরের) কাছে অনুযোগ জানিয়েছে, এই মায়া থেকে উদ্ধার করার জন্য। এই মায়া মুক্তি এবং সাধ্য লাভের কথা বৈষ্ণব সাহিত্যে বা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে সাধ্য-সাধন তত্ত্বে বলা হয়েছে। রামানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব গোদাবরীর তীরে এই তত্ত্ব আলোচনা করেছিলেন। এখানেই উঠে এসেছিল জ্ঞানশূন্য ভক্তির কথা। অর্থাৎ জ্ঞানশূন্য ভক্তি দ্বারাই যে ঈশ্বর লাভ করা যায় তার কথা, যে কথা আমরা চর্যাপদ, নাথ, শাক্ত, সুফি, বাউল সমস্ত সাধনাতেই পাই। সেই ভক্তির কথা চৈতন্যদেবও বলেছেন রায় রামানন্দকে—

"জ্ঞানে প্রয়াস মুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সম্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাং।
স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যৈ প্রায়শোহজিতজিতোহপ্যসি তৈ স্ত্রিলোক্যাং।।"[১৫]

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত(শ্রীমৎভাগবত))

এখানেও সেই জ্ঞান মার্গের পথ ছেড়ে ভগবানের উদ্দেশ্যে উপাসনার কথা বলা হয়েছে। আবার রামানন্দ মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সঙ্গে আলোচনার সময় 'প্রেমভক্তি' যে সর্বসাধ্যসার তাও বলেছেন। আর এই প্রেমভক্তি কি রকম হওয়া চাই, তা বলতে গিয়ে 'কান্তা প্রেম সর্বসাধ্যসার'। অর্থাৎ প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে যেমন প্রেম ভক্তি থাকে, সেরকম ভক্তির দ্বারাই ঈশ্বরকে লাভ করা যায়। এর উদাহরণ হিসাবে 'রাধার' কথা রামানন্দ বলেছেন। অর্থাৎ

কৃষ্ণ বা ভগবানকেই সবকিছু ধরে জাগতিক বাধা বন্ধন অতিক্রম করে কৃষ্ণের সাধনা করতে হবে, ঠিক যেমনটা আমরা চর্যাপদ, নাথ, শাক্ত, সুফি, বাউল প্রভৃতি সাধনায় দেখেছিলাম।

আবার সুফিবাদেরও অভীষ্ট হচ্ছে ঈশ্বরে লীন হয়ে যাওয়া, যা কিছুটা সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মের মতো ঈশ্বরকেই সর্বোস্ব মেনে তার কাছেই আত্মসমর্পণ করা, বাউলে যা 'মনের মানুষের' সন্ধান, চর্যাপদে কায়াসাধন, নাথ সাহিত্যেও কায়াসাধন। সুফিবাদে ঈশ্বরের সঙ্গে লীন হয়ে যাওয়া অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা একাত্ম হওয়ার ক্ষেত্রে কয়েকটি স্তরের কথা বলা হয়েছে। ঈশ্বরের নৈকট্য লাভে ইসলামী শাস্ত্রে সাধন পথের চারটি স্তর অতিক্রম করতে হয়-শরিয়ত, তরিকত, হকিকত ও মারিফত। পাঞ্জু শাহ তাই বলেন-

"আল্লাহতালা চার রাহা করিয়াছে তায়।
শরীয়ত তরিকত জানিবা ত্বরায়।।
হকিকত মারুফত এই চারি হয়।
চারি রাহে দুই ভেদ জানিবা নিশ্চয়।।"[১৬]

এই চারটি স্তরের মধ্যে মারিফত ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের সর্বোচ্চ স্তর। এই স্তরে তর্ক-যৌক্তিকভাবে পরিহার করা হয়। ঠিক একই কথা সহজিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যেও বলা হয়েছে যুক্তি-তর্কহীন ঈশ্বরের প্রতি প্রেম নিবেদনের কথা। এই তর্ক-যুক্তি পরিহার করেই ঈশ্বরের জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। সুফি যখন ফানা থেকে বাকায় পৌঁছান তখন তার বিভ্রম কেটে যায়। সাধক সার্বিক মিলনের স্তরে একাত্ম হয়ে যান। সুফিবাদেও বলা হয়েছে নিজেকে জানার দ্বারাই ঈশ্বরকে জানা যায়। এ কথা চর্যাপদ, নাথ সাহিত্যে, শাক্ত, বৈষ্ণব, বাউলেও আছে। চর্যাপদ, নাথ সাহিত্যে এবং বাউলে সেই দেহ সাধনার কথা বলা হয়েছে। আবার সুফিবাদেও পীর বা গুরু শিষ্যকে পথ দেখান, যেমন চর্যাপদ, নাথ, বৈষ্ণব, ও বাউলে গুরু-শিষ্য পরম্পরা আছে, তেমনি সুফিবাদেও আছে।

চর্যাপদ, নাথ সাহিত্য, বৈষ্ণব সাহিত্য, শাক্ত সাহিত্য, বাউল, ও সুফিবাদ প্রভৃতির যদি এভাবে তুলনামূলক আলোচনা করা হয় তবে দেখা যাবে উভয়ের মধ্যেই সাদৃশ্য বর্তমান। উভয় সাহিত্য- সাধনার ধারাতেই সাধ্য বস্তু লাভের জন্য একই রকম পথের কথা বলা হয়েছে। চর্যাপদে যেমন দেহ সাধনার কথা আছে, তেমনি নাথ সাহিত্যেও আছে। বৈষ্ণব সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণকে লাভের কথা বলা হয়েছে জ্ঞানশূন্য ভক্তির দ্বারা অর্থাৎ সাধকের মনে জগতের কোনো রকম জ্ঞান থাকবে না। নিঃস্বার্থভাবে ভগবানের চরণে প্রেম নিবেদন করা। শ্রী চৈতন্যদেবের শেষ অবস্থা যেমন হয়েছিল দীব্যউন্মাদ, কোনোরকম জাগতিক জ্ঞান ছিল না। ঠিক যেমন চার্যার '৬' নং পদে হরিণ ও হরিণীর রূপক এর মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। হরিণের যেমন শেষ অবস্থা হয়েছিল, জাগতিক মায়া কেটে গিয়েছিল, খাদ্য-পানীয় সবকিছু ত্যাগ করেছিল। এক চরম উন্মাদের মতন অবস্থা হরিণেরও হয়েছিল, তার পরেই হরিণ মোক্ষলাভ করেছিল। নাথ সাহিত্যেও গোর্খনাথ কর্তৃক মীননাথের মায়া মুক্তি ঘটানো হয়েছে। শাক্ত সাহিত্য, বাউল, সুফিবাদ প্রভৃতিতেও মায়া মুক্তির কথা বলা হয়েছে। আবার এইসব সাহিত্যে দেহ সাধনার দ্বারা যে সাধ্য বস্তু লাভ করা যায় তাও বলা হয়েছে।

শুধু এইসব সাহিত্যেই নয়, মায়ায় পড়ার কথা ও মায়া মুক্তির কথা আধুনিক যুগের রচিত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যেও আছে-

"এই ঠাঁই মনেরে সংযত কর, সিদ্ধি লাভ হবে।
হয়ে উপবিষ্ট
হও উপদিষ্ট,
সেই ধন পা'বে যা'র তুল্য নাই ভবে।।"[১৭]

আবার এখানেও সংসার রূপ গভীর অরণ্যের কথা বলা হয়েছে। আর এই অরণ্যে মায়া রূপে সাপ, ডাকিনী, বাঘ বাঘ প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে। এই গভীর অরণ্য রূপ সংসারকে পার করলেই (কাব্যে যাকে পর্বত শিখর বলা হয়েছে) সেখানে উপনীত হলেই পরম কাম্য বস্তু পাওয়া যাবে। কিন্তু এই বন পার করা সহজ নয়, সেখানে নানান হিংস্র জন্তুর বাস। বাঘ, সাপ প্রভৃতি ভয়ঙ্কর জন্তুর দ্বারা আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা অর্থাৎ এই গহীন ভব সংসার পার করতে গেলে লোভ, মায়ায় পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই মায়া থেকে মুক্ত হওয়াও কঠিন। চর্যাপদে যা সাঁকোর রূপকের মাধ্যমে বলা হয়েছে যে, ডান-বাঁমে গেলেই বিপদ, এখানেও ঠিক তাই হিংস্র জন্তুর দ্বারা আক্রান্তের সম্ভাবনা। অর্থাৎ সংসারে চলতে গেলে ডানে-বাঁমে বা লোভ-লালসার দ্বারা আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা। কিন্তু আমাদের উচিত লোভ-লালসা মুক্ত হয়েই সোজা পথে চলা।

এই লোভ-লালসা বা মায়া-মোহ থেকে মুক্ত হওয়ার কথা চর্যাপদ থেকে শুরু করে বাউল, সুফি সমস্ত সাহিত্যেই বা ধর্মীয় আদেশে তথা সাক্ষাতেই পাওয়া যায়। কিন্তু চর্যাপদে সাধ্য বস্তু রূপে যেমন মোক্ষলাভের কথা বলা আছে, তেমনি বৈষ্ণব বা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম বা সাহিত্যে ঈশ্বর লাভের কথা বলা আছে। তেমনি নাথ সাহিত্য বা সাধনায় অমরত্ব লাভ, সুফিতে মনের মানুষ বা ঈশ্বর লাভের কথা বলা হয়েছে। এভাবে দেখলে দেখা যাবে সাধ্যবস্তুর কিছুটা পার্থক্য থাকলেও সাধ্যবস্তু লাভের যে পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে তা মূলত একই। লৌকিক জগতের মায়া মুক্ত হয়েই যে সাধ্য বস্তু লাভের পথে অগ্রসর হওয়া যায়, সেই কথা সকল সাহিত্য-সাধনাতেই আছে। এই মায়ার জন্য আমরা আমাদের প্রকৃত স্বরূপটাকে চিনতে পারি না। আমরা আমাদের উদ্দেশ্য- লক্ষ্য সম্পর্কেও ভুলে যাই এবং এই জাগতিক মায়াকেই সত্য বলে মেনে নেই। এই মায়া মুক্তির কথা, সাধ্যকে লাভ করার পদ্ধতির কথা চর্যাপদ, নাথ সাহিত্য, বৈষ্ণব সাহিত্য, বাউল, সুফি, শাক্ত সাহিত্য মধ্যযুগের এই সাহিত্য ছাড়াও আধুনিক যুগের সাহিত্যেও আছে, যেমন- 'স্বপ্নপ্রয়াণে'ও সেই রকম কথা বলা হয়েছে। এইসব সাহিত্যেই মায়া মুক্তির উপদেশ দেওয়া আছে। এইসব সাহিত্যে যে সাধনার কথা বলা হয়েছে সে গুলির মধ্যে তুলনা করলে সাদৃশ্যই চোখে পড়ে। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন সহজে বৌদ্ধদের সাধনা থেকে শুরু করে একেবারে আধুনিক সময় পর্যন্ত এক পরিক্রমায় দেখি, তবে বিভিন্ন সাহিত্য ধারাতেই আমরা সাধ্য বস্তুকে লাভ করার যে পদ্ধতির উল্লেখ পাই তার মধ্যে আছে এক গভীর সাদৃশ্য।

তথ্যসূত্র:

১. দাশ, নির্মল। চর্যাগীতি পরিক্রমা। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭০০ ০৭৩, অগ্রহায়ণ, ১৪২৫, পৃ. ১১৭।
২. মন্ডল, পঞ্চানন। এম্-এ (সম্পাদিত), গোর্খ -বিজয়। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ২, কলকাতা, অগ্রহায়ন, ১৩৫৬, পৃ. ৯৫।
৩. লালা, আদিত্যকুমার। বাংলার নাথধর্ম ও নাথসাহিত্য। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০ ০৭৩, মাঘ, ১৪২৬, পৃ. ৫০।
৪. চৌধুরী, মিহির। কামিল্যা, নির্বাচিত চর্যাপদ। শিলালিপি পাবলিশার্স, কলকাতা -৭০০ ০০৯, আগস্ট, ২০১৮, পৃ. ৪৯-৫০।
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত। তৃতীয় খন্ড: দ্বিতীয় পর্ব, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা- ৭০০ ০৭৩, ২০১৯- ২০২০, পৃ. ৩৫৯।
৬. চৌধুরী, মিহির। কামিল্যা, নির্বাচিত চর্যাপদ। শিলালিপি পাবলিশার্স, কলকাতা- ৭০০ ০০৯, আগস্ট, ২০১৮, পৃ. ৭২।

৭. মন্ডল, পঞ্চানন। এম্-এ (সম্পাদিত), গোর্খ-বিজয়। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ২, কলকাতা, অগ্রহায়ন, ১৩৫৬, পৃ. ৮০।
৮. দাশ, নির্মল। চর্যাগীতি পরিক্রমা। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭০০ ০৭৩, অগ্রহায়ণ, ১৪২৫, পৃ. ১৯৮।
৯. চৌধুরী, মিহির। কামিল্যা, নির্বাচিত চর্যাপদ। শিলালিপি পাবলিশার্স, কলকাতা -৭০০ ০০৯, আগস্ট, ২০১৮, পৃ. ৪৭।
১০. মন্ডল, পঞ্চানন। এম্-এ (সম্পাদিত), গোর্খ -বিজয়। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ২, কলকাতা, অগ্রহায়ন, ১৩৫৬, পৃ. ৯২।
১১. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত। তৃতীয় খন্ড: দ্বিতীয় পর্ব, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা- ৭০০ ০৭৩, ২০১৯- ২০২০, পৃ. ৩৮৮।
১২. কৃষ্ণদাস। শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত। আনন্দ পাবলিশার্স, সুকুমার সেন, তারাপদ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), কলকাতা -৭০০ ০০৯, ফাল্গুন, ১৪২৬, পৃ. ৭।
১৩. রায়, শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত)। শাক্ত পদাবলী (চয়ন)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০, পৃ. ১৭৬।
১৪. তদেব, পৃ. ১০৯।
১৫. কৃষ্ণদাস। শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত। আনন্দ পাবলিশার্স, সুকুমার সেন, তারাপদ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত)। কলকাতা -৭০০ ০০৯, ফাল্গুন, ১৪২৬, পৃ. ১৭৭।
১৬. ওয়াহাব, আব্দুল। বাংলার বাউল। সুফি সাধনা ও সংগীত, রত্নাবলী পাবলিশার্স, কলকাতা- ৭০০ ০০৯, প্রথম প্রকাশ, মে, ১৯৯৯, পৃ. ৮৪।
১৭. লালা, আদিত্যকুমার (সম্পাদনা)। স্বপ্ন-প্রয়াণ, মননে-অনুভবে। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭০০ ০৭৩, পৃ. ২৩৩।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. দাশ, নির্মল। চর্যাগীতি পরিক্রমা। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭০০ ০৭৩, অগ্রহায়ণ, ১৪২৫।
২. মন্ডল, পঞ্চানন এম্-এ (সম্পাদিত)। গোর্খ -বিজয়। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ২, কলকাতা, অগ্রহায়ন, ১৩৫৬।
৩. লালা, আদিত্যকুমার। বাংলার নাথধর্ম ও নাথসাহিত্য। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা -৭০০ ০৭৩, মাঘ, ১৪২৬।
৪. কামিল্যা, চৌধুরী, মিহির। নির্বাচিত চর্যাপদ। শিলালিপি পাবলিশার্স, কলকাতা -৭০০ ০০৯, আগস্ট, ২০১৮।
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত। তৃতীয় খন্ড: দ্বিতীয় পর্ব, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা- ৭০০ ০৭৩, ২০১৯-২০২০।
৬. কৃষ্ণদাস। শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত। আনন্দ পাবলিশার্স, সুকুমার সেন, তারাপদ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), কলকাতা- ৭০০ ০০৯, ফাল্গুন, ১৪২৬।
৭. রায়, শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত)। শাক্ত পদাবলী (চয়ন)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০।
৮. ওয়াহাব, আব্দুল। বাংলার বাউল, সুফি সাধনা ও সংগীত। রত্নাবলী পাবলিশার্স, কলকাতা- ৭০০ ০০৯, প্রথম প্রকাশ, মে, ১৯৯৯।
৯. লালা, আদিত্যকুমার (সম্পাদনা)। স্বপ্ন-প্রয়াণ, মননে-অনুভবে। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭০০ ০৭৩